শ্রেণী ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বলে অনাবিষ্কৃত হাজারো সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কি পরিমাণ প্রকার রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ – এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। سلخ এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু জাহির হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ – অর্থাৎ সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। مستقر শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়।---(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কিয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষপথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌঁছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে।---(ইবনে কাসীর)

সূরা যুমারের এক আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, مستقر--এর অর্থ কিয়ামতের দিন। আয়াতটি এই ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى –

এতেও সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী রূপক আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিবসকে এবং দিবস দ্বারা রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে দেন। রাত্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রাত্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিলে রাত্রি হয়ে যায় এবং দিনের আবরণ রাত্রির উপর ফেলে দিলে দিন হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে أجل مسمى শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গতি নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌঁছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াতেও বাহ্যত مستقر শব্দ দ্বারা এই নির্দিষ্ট মেয়াদই বোঝানো হয়েছে। এ তফসীরের অর্থেও কোন খটকা নেই এবং সৌর বিজ্ঞানের আলোকেও কোন আপত্তি নেই।

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন।

আবূ যর গিফারী (রা) একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূ যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবূ যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে। অতপর বললেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আয়াতে مستقر বলে তাই বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ যরেরই এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন، مستقرها تحت العرش ইমাম বুখারী একাধিক জায়গায় রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকেও এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আরও আছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত যেয়ে পশ্চিম থেকে উদিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্গার, কাফির ও মুশরিকের তওবা কবূল করা হবে না।

---(ইবনে কাসীর)

আরশের নিচে সূর্যের সিজদা ঃ এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বোঝানো হয়েছে, যেখানে সূর্যের গতি শেষ

হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌঁছার পর শেষ হয়। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিভ্রমণ শুরু করে।

কিন্তু ঘটনাবলী, চাক্ষুষ প্রমাণ এবং সৌর বিজ্ঞানের বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী খট্‌কা দেখা দেয়।

প্রথম, কোরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমগ্র নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আরশের নিচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি?

দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করার অর্থ কি?

তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে পৌঁছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করত পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোন বিরতি নেই। অতপর সূর্যের উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে যেহেতু সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে সূর্য কোন সময় গতিশীলই হবে না।

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মতবাদ ছিল এই যে, সূর্য সর্বোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, বাৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল। সাম্প্রতিক-কালের মহাশূণ্য ভ্রমণ এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত; আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। কোরআন পাকের وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত হয়। এতে আরও আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে নয়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে। এ মতবাদের দিক দিয়ে উপরোক্ত হাদীসে আরও একটি খট্‌কা দেখা দেয়।

এর জওয়াব অনুধাবন করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কোরআনের বিরুদ্ধে কোন খট্‌কাই দেখা দেয় না। আলোচ্য আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আল্লাহ্ তা'আলা এক সুশৃঙ্খল ও অটল গতি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের দিকে বিচরণ করতে থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী 'কিয়ামতের দিন' নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় একই অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকক্ষের সেই বিন্দুকে সূর্যের অবস্থানস্থল বলা যায়, যেখান থেকে জন্মলগ্ন থেকে সূর্য তার ভ্রমণ শুরু করেছিল, এখানে পৌঁছেই তার দিবা-রাত্রির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিভ্রমণের চূড়ান্ত সীমা। এই বিন্দুতে পৌঁছে তার নতুন পরিভ্রমণ শুরু হয়। এখন এই মহাগোলকের বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিভ্রমণের সূচনা হয়েছিল, কোরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এটিও এমনি ধরনের আলেচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কোরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল গোলক সূর্যও আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোন গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না কিংবা অব্যাহত থাকতে পারে না। বরং সে তার দিবা-রাত্রির বিচরণে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছার অধীন হয়ে চলে।

উপরে যতগুলো খট্‌কা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা দেয় না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করা ও পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবগুলো খটকা সে হাদীসের সাথেই সম্পৃক্ত। হাদীসে যেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলোচনার অবতারণা করা হল। হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যের সিজদা দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে। যারা হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। এক, যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার অধিকাংশ জনবসতিতে অস্ত হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বোঝানো হয়েছে। দুই. বিষুব রেখার অস্ত বোঝানো হয়েছে এবং তিন, মদীনার দিগন্তে অস্ত বোঝানো হয়েছে। এভাবে এ খট্‌কা থাকে না যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে একটি বিশেষ দিগন্তে অস্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র)-র জওয়াবই পরিষ্কার ও নির্মল। কয়েকজন তফসীরবিদের উক্তি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়।

'সূজুদুশ্ শামস' নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর এই জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে পয়গম্বরগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে নেওয়া জরুরী যে, আসমানী কিতাব ও পয়গম্বরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তওহীদ, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পার্থিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিক সূলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন করতে সক্ষম হননি—সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অর্জিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোন বিশুদ্ধ পার্থিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কোরআন ও পয়গম্বরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষণ একমাত্র দার্শনিক ও আলিমগণই করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা জ্ঞানী হোক কিংবা মূর্খ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা ফরয। তাই, পয়গম্বরগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরূপ কারিগরি পারদর্শিতার প্রয়োজন হয় না।

নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কিবলার দিক নির্ধারণ, বছর, মাস ও দিন-তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্জ ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

অর্থাৎ আপনি উত্তরে বলুন, চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও দিন-তারিখ জেনে হজ্জের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজ

নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বলেছেন, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ অতপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন اَحْيَيْنٰهَا الاية এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ.. এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য এ কথা ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা-আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সূর্যাস্তের সময় এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত আবূযর গিফারীকে এ সত্যটি জেনে নেওয়ারই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে আল্লাহ্কে সিজদা করে এবং পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যূষে পূর্ব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না। সে কেবল আল্লাহ্র অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে। তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সিজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর সিজদা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। কোরআন বলে, كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহ্র ইবাদত ও তসবীহ্ করে এবং প্রত্যেককে তার ইবাদত ও তসবীহ্র পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে তার নামায

ও তসবীহ্‌র পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সিজদা করার অর্থ এরূপ বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সিজদা করে।

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আরশের নিচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমর্ম এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের নিচে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারত থাকে। অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিভ্রমণ করে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে। অতপর যখন কিয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ সময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারও ঈমান ও তওবা কবূল করা হবে না।

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতপর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পয়গম্বরসুলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌঁছে পুরোপুরি একটি উপমা মাত্র; এতে জরুরী হয় না যে, সূর্য মানুষের মত মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করে এবং সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে সিজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। কিন্তু এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নিচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোন শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তখন মদীনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য সিজদা করে পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় অস্ত হতে থাকবে, সকলের জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌কে সিজদাও করে এবং সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুতে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সৌর ও অঙ্ক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই কোন আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না।

তথাপি আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসে সূর্যের সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও

জ্ঞানবুদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নির্জীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কিরূপে সম্পাদন করতে পারে? কোরআন পাকের وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ আয়াতটি এ প্রশ্নের জওয়াব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নির্জীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনার অধিকারী। তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তুর তুলনায় এত কম যে, সাধারণ-ভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত অথবা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই। কোরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ

জ্ঞাতব্য ঃ কোরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। এতে সে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি। সর্বাধুনিক গবেষণাও এ মতবাদকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ — عُرْجُوْن

অর্থ শুষ্ক খর্জুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। مَنَازِل শব্দটি مَنْزِل-এর বহুবচন। অর্থ অবতরণ স্থল। আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মনযিল' বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল ঃ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহিলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হত। কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের ঊর্ধ্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূরা ইউনুসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের আয়াত এই ঃ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুষ চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা

হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী 'শুষ্ক খর্জুর শাখার মত' বলে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ——অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। فلك-এর শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। বাৎলীমূসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নিচে এক বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত সত্যে পরিণত করেছে।

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ——এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তানসন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানসন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষত যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রই এসব নৌকা বহন করে। خَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তূপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سفينة البر অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ ঃ কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমন সব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসূদে পৌঁছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানত উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার

সাথে এর উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানীর উপর সন্তরণ করে পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস তাকে নিচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলাচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ
مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

(৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের আযাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিররা মু'মিনগণকে বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে (তওহীদের প্রমাণাদি এবং তা অমান্য করার কারণে শাস্তিদাতার সতর্ক বাণী শুনিয়ে) বলা হয়, তোমরা সে আযাবকে ভয় কর, যা তোমাদের সামনে রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে। যেমন, উপরে وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ আয়াতে ইচ্ছা করলে নৌকা নিমজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে।) এবং যা তোমাদের (মৃত্যুর) পেছনে (অর্থাৎ পরকালে) রয়েছে, (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ অমান্য করার কারণে কেবল দুনিয়াতে অথবা পরকালে যে আযাব তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, তাকে ভয় এবং বিশ্বাস স্থাপন কর) যাতে তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করা হয়, তখন তারা (এই ভীতি প্রদর্শনের) পরওয়া করে না। (তারা তো এমন কঠোরপ্রাণ যে,) যখনই তাদের পালনকর্তার আয়াত-সমূহের মধ্য থেকে কোন আয়াত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ভীতি প্রদর্শন যেমন তাদের জন্য উপকারী নয়, তেমনি সওয়াব ও জান্নাতের সুসংবাদও তাদের জন্য উপকারী হয় না। সেমতে) যখন তাদেরকে আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ

করিয়ে) বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে ফকির-মিসকীনদের জন্য) ব্যয় কর, তখন (হঠকারিতা ও উপহাস করলে কাফিররা) মুসলমানদেরকে (যারা ব্যয় করতে বলেছিল) বলে, আমরা কি এমন লোকদের খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (অনেক কিছু) খাওয়াতে পারতেন? তোমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবূলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবূল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফিরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের দু'টি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদেরকে বলে, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই তোমরা শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। আয়াতে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, পরবর্তী আয়াতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখানেও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে إِذَا قِيلَ শর্ত। এর جزاء হিসাবে اعرضوا শব্দটি উহ্য রয়েছে। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতের مُعْرِضِينَ শব্দটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার যে কোন আয়াত আসে, তারা তা থেকে কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয়।

পরোক্ষভাবে রিযিক প্রাপ্তির রহস্য ঃ দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা গরীব-মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের জন্য কাফিরদেরকে বলত, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর। এর জওয়াবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরাই বল যে, সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। কেননা তোমরা আমাদেরকে রিযিকদাতা বানাতে চাও। বলা বাহুল্য, কাফিররাও আল্লাহ্ তা'আলাকে রিযিকদাতা বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ

مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ——অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অতপর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম ফলমূল উদ্‌গত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্টার ছলে উপরোক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য করাকে আল্লাহ্‌র রিযিকদাতা হওয়ার পরিপন্থী মনে করত। রিযিকদাতা আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময় আইন এই যে, তিনি একজনকে দান করে অন্য জনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেন। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিযিক দিতেও সক্ষম। জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণসঞ্চার করার জন্য রিযিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা সওয়াব পায় এবং গ্রহীতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই ভিত্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার মুখাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও কোন ঋণ নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফিররা তো আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং ফিকাহ্‌বিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুঁটিনাটি বিধানাবলী পালনে আদিষ্টও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিসের ভিত্তিতে কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোন শরীয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং মানবিক সহমর্মিতা ও ভদ্রতার প্রচলিত নীতির ভিত্তিতে ছিল।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا

صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ
اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ
هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ
فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ ۚ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ
رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ
يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ
اعْبُدُوْنِىْ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۭ
اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ
تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ
لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ
نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا
يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۭ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

(৪৮) তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও

সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। (৫১) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৫২) তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। (৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (৫৫) এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং যা চাইবে। (৫৮) করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (৬১) এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হতো (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌঁড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (অর্থাৎ কাফিররা পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীদেরকে অস্বীকারের ছলে) বলে, তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হলে, (বল,) এই ওয়াদা (অর্থাৎ কিয়ামতের ওয়াদা, যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তোমরাও প্রায়ই এর কথা বলে থাক—) কবে পূর্ণ হবে? (আল্লাহ্ বলেন, এরা যে বারবার জিজ্ঞেস করে, এতে করে মনে হয় যেন,) তারা এক মহানাদের (অর্থাৎ প্রথম ফুঁৎকারের) অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত হানবে (সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের ব্যাপারাদিতে পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (এই মহানাদের সাথে সাথে তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যে,) তখন তারা ওসিয়ত করতে সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফেরত যেতে পারবে না (বরং যে যে অবস্থায় থাকবে, মরে কাঠ হয়ে যাবে।) এবং (অতপর পুনরায়) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে (বের

হবে) তাদের পালনকর্তার দিকে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়) দ্রুত চলতে থাকবে। (সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে) তারা বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ, আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে কে উঠাল? (আমরা তো সেখানেই আরামে ছিলাম। ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবেন,) রহমান আল্লাহ্ তো এরই (অর্থাৎ এ কিয়ামতেরই) ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ এ সত্যই বলেছিলেন। (কিন্তু তোমরা তখন মাননি। অতপর আল্লাহ্ বলেন, এটা (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁক) তো হবে এক মহানাদ (যেমন প্রথম ফুঁকও এক মহানাদ ছিল) ফলে সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। পূর্বে চলার কথা হয়েছিল, এখানে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। উভয়টিই বাধ্যতামূলক ও জোরপূর্বক হবে। কোরআনের ভাষা جَاءَتْ এবং مُحْضَرُونَ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ থেকে জানা যায়।) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা (দুনিয়াতে কুফর ইত্যাদি) যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল পাবে। (এখন জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে,) নিশ্চয়ই জান্নাতীরা এদিনে তাদের আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে (সর্বপ্রকার) ফলমূল এবং প্রার্থিত সব কিছু। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হবে। [অর্থাৎ আল্লাহ্ বলবেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল-জান্নাত---(ইবনে মাজা)। অতপর আবার জাহান্নামীদের অবস্থার পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরে তাদেরকে আদেশ করা হবে] হে অপরাধীরা (যারা কুফুরী করেছিলে), আজ তোমরা (মু'মিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও। (কারণ তাদেরকে জান্নাতে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে। তখন তাদেরকে তিরস্কারছলে বলা হবে,) হে বনী আদম! (এমনিভাবে জিনদেরকেও সম্বোধন করা হবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) আমি কি তোমাদেরকে জোর দিয়ে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু; বরং আমারই ইবাদত কর? এটাই সরল পথ। [ইবাদতের অর্থ এখানে আনুগত্য করা। যেমন, এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ অন্য আয়াতে আছে ঃ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ এ ছাড়া শয়তান সম্পর্কে তোমাদের আরও জানান হয়েছিল যে, সে তোমাদের (বনী-আদমের) অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তোমাদের পথভ্রষ্টতার শাস্তি ও অতীত সম্প্রদায়সমূহের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা কি বুঝনি (যে, তার প্ররোচনায় আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে আমরাও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাব? অতএব) এই সে

জাহান্নাম, (কুফর করা হলে) যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। অদ্য তোমাদের কুফরের কারণে এতে প্রবেশ কর। আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব (ফলে তারা মিথ্যা ওযর পেশ করতে পারবে না। যেমন, শুরুতে বলবে وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (এ শাস্তি তো হবে পরকালে) আমি ইচ্ছা করলে (দুনিয়াতেই তাদের কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করতে পারতাম (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে অথবা চক্ষুই লোপ করে) তখন তারা পথের দিকে (চলার জন্য দৌড়াতে) চাইলে কি করে দেখতে পেত? (লূত সম্প্রদায়ের উপর এমনি আযাব এসেছিল। আল্লাহ্ বলেন, فَطَمَسْنَا তদুপরি) আমি ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তাদের আকৃতি বদলে দিতে পারতাম (যেমন, পুরাকালে কতক লোক বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল।) এমতাবস্থায় তারা যে যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যেত। (অর্থাৎ বদলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিকলাঙ্গ জানোয়ার বানিয়ে দিতাম, যে স্বস্থান ত্যাগ করতে পারে না) ফলে তারা অগ্রেও চলতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে যেতে পারত না। (এই চক্ষু লোপ করা ও আকার বিকৃত করার ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, এটা কিরূপে হতে পারত। এরই অনুরূপ আমার একটি কাজ দেখ) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, (অর্থাৎ খুব বয়োবৃদ্ধি করি,) তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় উপুড় করে দেই। (স্বাভাবিক অবস্থা বলে জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি ইত্যাদি এবং রঙ-রূপ ও সৌন্দর্য বোঝানো হয়েছে। উপুড় করার অর্থ তার অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে এবং ভাল থেকে মন্দের দিকে ধাবমান করে দেওয়া। সুতরাং লোপ করা এবং বিকৃত করাও এক প্রকার পূর্ণত্ব থেকে অপূর্ণত্বের দিকে ধাবমান করা।) অতএব (এ অবস্থা দেখেও) তারা কি বুঝেনি? (আল্লাহ্ যখন এক পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন অন্য পরিবর্তনও করতে পারবেন; বরং আল্লাহ্ সম্ভাব্য সবকিছু করতে সমান সক্ষম। অতএব এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে তাদের সতর্ক হওয়া ও কুফর বর্জন করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ কাফিররা যে مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً বলে ঠাট্টা ও পরিহাসছলে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কিয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন্ বছর ও কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে? বর্ণিত আয়াতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় ে নার জন্য নয়; বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিল। জানার জন্য হলেও কিয় তের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেওয়াই আল্লাহ্র রহস্যের দাবি ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রসূলকেও দান করেন নি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে

কিয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি, কিন্তু তারা এমনি গাফিল যে, কিয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে, তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত হবে একটি মাত্র মহানাদ যা তাদেরকে তখন অতর্কিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেনদেনের বাকবিতণ্ডায় রত থাকবে। সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ে রত থাকবে; সামনে বস্ত্র খোলা থাকবে আর এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা বস্ত্রটি ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। কোন ব্যক্তি হয়তো তার চৌবাচ্চাটিতে মাটি দ্বারা লেপ দিতে থাকবে এবং তদাবস্থায়ই মরে যাবে।----(কুরতুবী)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ—অর্থাৎ তখন যারা একত্রিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না। আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ শব্দটি اجداث—جدث-এর বহুবচন। অর্থ কবর। ينسلون শব্দটি نسلان থেকে উদ্ভূত। অর্থ দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا يَخْرُجُونَ—অর্থাৎ তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ—অর্থাৎ হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে উপস্থিত হবে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا - কাফিররা কবরেও আরামে ছিল না, বরং কবরের আযাবে পতিত ছিল। কিন্তু কিয়ামতের আযাবের তুলনায় সে আযাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মু'মিনগণ এর জওয়াবে বলবে ঃ

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ—অর্থাৎ করুণাময় আল্লাহ্ যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কিয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রূক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহ্র 'রহমান' গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য এ আযাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেওয়া এবং কিতাব ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌঁছানো আল্লাহ্র 'রহমান' গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ—জাহান্নামীদের দুরবস্থা বর্ণনা করার পর কিয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। فَاكِهُونَ--এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল ঃ فِي شُغُلٍ--এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে।

এ স্থলে فِي شُغُلٍ সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জান্নাতে ফরয-ওয়াজিব কোন ইবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণত অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

أَزْوَاجُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ—শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ—শব্দটি دعوت থেকে উদ্ভূত। অর্থ আহবান করা। অর্থাৎ জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেত্রে

يسئلون বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ — হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ— অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফির, মু'মিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ — অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এমনকি, জ্বিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফিররা সাধারণত শয়তানের ইবাদত করত না, বরং দেবদেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে প্রতিটি এমন কাজ করে, যদ্দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে প্রতিটি এমন কাজ করে যদ্দ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোন কোন সূফী বুযুর্গের ভাষণে নফসের অনুসরণকে মূর্তি পূজা বলা হয়েছে। এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা; কুফর ও শিরক অর্থ নয়। জনৈক সাধক কবি বলেছেন ঃ

سود ہ گشت از سجد ہ راہ بتاں پیشا نیم
چند بر خود تہمت دین مسلمانی نہم

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ — হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে শপথ সহকারে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছু বলতে না পারে। অতপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফিরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্যদানের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ অর্থাৎ তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। এটা আলোচ্য আয়াতের অর্থাৎ মুখে মোহর এঁটে দেওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, মোহর করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজ ক্ষমতায় কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহবাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে।

এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাকশক্তি কোথা থেকে আসবে, এ প্রশ্নের জওয়াব কোরআনেই বর্ণিত হয়েছে যে, اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক বাকশক্তিসম্পন্নকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ — نُعَمِّرْ শব্দটি تَعْمِيْر থেকে উদ্ভূত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা। نُنَكِّسْ শব্দটি تَنْكِيْس থেকে উদগত। অর্থ উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃ-প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিষ্প্রাণ ফোঁটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী-গর্ভে লালিত-পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি

তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাসপ্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌঁছে সে আবার সে স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তাই হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

من عاش اخلقت الايام جدته
وخانه ثقتاه السمع والبصر

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবেন, কালের আবর্তন তার নতুনত্ব ও শক্তিমত্তাকে জীর্ণ ও মলিন করে দেবে এবং তার সর্বপ্রধান দুই বন্ধু অর্থাৎ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথক হয়ে যাবে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌঁছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে। মুতানাব্বী তাই বলেছেন ঃ

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت
على عينه حتى يرى صدقها كذبا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তার চোখের সামনেই দুনিয়া পাল্টে যায়। ফলে পূর্বে যে বিষয়কে সত্য মনে করত, তা মিথ্যা প্রতীয়মান হতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেওয়া বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময়

আল্লাহ্ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝۶۹
لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكٰفِرِيْنَ ۝۷۰ اَوَلَمْ يَرَوْا
اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝۷۱
وَذَلَّلّٰنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝۷۲ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝۷۳ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً
لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝۷۴ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُّحْضَرُوْنَ ۝۷۵

(৬৯) আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটাতো কেবল এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। (৭০) যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। (৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতপর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (৭৪) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীরূপে ধৃত হয়ে আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার জন্য রসূল (সা)-কে কবি বলে। এটা নির্জলা মিথ্যা। কেননা,] আমি রসূল (সা)-কে কবিতা (অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয় রচনা করতে)

শিক্ষা দেইনি এবং তা (কাব্য রচনা) তার জন্য শোভনীয়ও নয়। তা (অর্থাৎ রসূলকে প্রদত্ত জ্ঞান) তো কেবল এক উপদেশ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ, যা বিধানাবলী প্রকাশ করে, যাতে (বিধানাবলী বর্ণনার প্রভাবে) তিনি এমন ব্যক্তিকে (কল্যাণজনক) ভয় প্রদর্শন করেন, যে (আত্মিক জীবনের দিক দিয়ে) জীবিত এবং (যাতে) কাফিরদের বিরুদ্ধে আযাবের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) কি দেখে না যে, আমি তাদের (কল্যাণের) জন্য নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতপর (আমার মালিক করার কারণে) তারাই এগুলোর মালিক। (অতপর কল্যাণের কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। অতপর এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। এগুলোতে তাদের জন্য আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন, লোম, চামড়া ও হাড় প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয়।) এবং (এগুলোতে তাদের) পানীয় বস্তুও (অর্থাৎ দুগ্ধ) আছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (শুকরিয়ার সর্বপ্রথম ও প্রধান স্তর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। কিন্তু) তারা (তওহীদে বিশ্বাস করার পরিবর্তে কুফর ও শিরক করে যাচ্ছে। সেমতে) আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা (এ উপাস্যদের পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তারা তাদেরকে কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। (সাহায্য তো দূরের কথা) উল্টা তারা তাদের এক প্রতিপক্ষ হবে (এবং হিসাবের জায়গায় জোরপূর্বক) ধৃত হয়ে আসবে (সেখানে হাযির হয়ে তারা উপাসনাকারীদের বিরোধিতা প্রকাশ করবে। যেমন, আল্লাহ্ সূরা মরিয়মে বলেন ঃ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এবং সূরা ইউনুসে বলেন ঃ

قَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ — নবুয়ত অমান্যকারী কাফিররা মানুষের মনে কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব আল্লাহ্র কালাম হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলেছে? কারণ, কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলার পেছনে কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি।

ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, না; তবে ইবনে তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। পংক্তিটি এই ঃ

ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا
ویاتیک بالاخبار من لم تزود

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, من لم تزود بالاخبار - আবৃত্তি করলে হযরত আবূবকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাঁর কিছু বাক্য কবিতার ছন্দ অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে। এগুলো কবিতার উদ্দেশ্যে নয়, ঘটনাচক্রে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে দু'চারটি ছন্দযুক্ত বাক্য কারও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই রহস্যভিত্তিক স্বাভাবিক অবস্থা থেকে এটা জরুরী হয় না যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায়ই নিন্দনীয়। কবিতা ও কাব্যচর্চা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানাবলী সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্র দান পুঁজি ও শ্রম নয়ঃ আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, না শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমের প্রবক্তারা শ্রমকে মালিকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে যে বস্তু সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলারই। যেকোন বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ — এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ এখানে جُنْدٌ-এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর এই যে, কাফিররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হিফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ
لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ
الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ
الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

(৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা-কারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচেগলে যাবে? (৭৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮০) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিররা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচরণই করে) অতএব (তওহীদ ও রিসালত অস্বীকার সম্পর্কিত) তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। [কেননা, দুঃখ হয় আশার কারণে, আর আশা হয় প্রতিপক্ষের বিবেক ও ইনসাফ থেকে। কিন্তু কাফিরদের মধ্যে বিবেক ও ইনসাফ বলতে কিছু নেই। সুতরাং তাদের থেকে আশাও হতে পারে না। অতএব দুঃখ কিসের? অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অন্যভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে,] নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (তাই নির্দিষ্ট সময়ে তারা তাদের কর্মের শাস্তি পাবে। কিয়ামত অস্বীকারকারী) মানুষ কি জানে না যে, আমি (নিকৃষ্ট) বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি (ফলে তার উচিত ছিল নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা স্মরণ করে এবং নিজের নিকৃষ্টতা ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য দেখে লজ্জাবোধ করা; ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করা। এছাড়া আরও চিন্তা করা উচিত ছিল যে, মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবিত করা আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়।) অতপর (সে এরূপ চিন্তা করল না; বরং এর বিপরীতে) সে প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডা করতে লাগল। (তার বাকবিতণ্ডা এই যে,) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিষয় বর্ণনা করছে। (অদ্ভুত একারণেও যে, এতে কুদরতের অস্বীকার জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং সে তার নিজের মূল ভুলে গেছে। (তা এই যে, আমি তাকে নিকৃষ্ট বীর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করেছি।) সে বলে, অস্থিকে কে জীবিত করবে, যখন তা পচেগলে যাবে? আপনি বলে দিন, তাকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (প্রথম সৃষ্টির সময় জীবনের সাথে এসব অস্থির কোন সম্পর্কই ছিল না এখন তো একবার এগুলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে জীবনের সাথে এক প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কাজেই পুনরায় এগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন কাজ নয়।) তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (অর্থাৎ প্রথমত কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা অথবা সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে পুনর্বার সৃষ্টি করা ইত্যাদি সব রকম সৃষ্টি কৌশলই তাঁর জানা।) তিনি (এমন সর্বশক্তিমান যে, কতক) সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপাদন করেন। অতপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (আরবে মারুখ ও ইফার নামক দু'রকম বৃক্ষ ছিল। এগুলোর সবুজ শাখা পরস্পরে সংযুক্ত করলে আগুন উৎপন্ন হত। লোকেরা এগুলোকে আগুন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করত। অতএব যিনি সবুজ বৃক্ষের পানিতে আগুন উৎপন্ন করেন, অন্যান্য জড় পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন?) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের মত মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই সক্ষম। তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (তাঁর কুদরত এমন যে,) তিনি যখন কোন কিছু (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হয়ে যা' তখনই তা হয়ে যায়। (এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনি পবিত্র, যাঁর হাতে সবকিছুর এখতিয়ার রয়েছে এবং (একথা স্বতঃসিদ্ধ যে,) তাঁরই দিকে তোমরা (কিয়ামতের দিন) প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ—সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী শোআবুল-ঈমান এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন।---(ইবনে কাসীর)

خَصِيمٌ مُّبِينٌ—অর্থাৎ নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্র কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে ঃ

ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا—আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضرب مثل (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَنَسِيَ خَلْقَهُ—অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিষ্প্রাণ একটি শুক্র বিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে আল্লাহ্র কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا—আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।---(কুরতুবী)

এ ছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের

নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

অর্থাৎ তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে তোমরা প্রজ্বলিত করে কাজে লাগাও ? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি ?

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شجر শব্দের সাথে اخضر (সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ —আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতপর কারিগর ডাকে, অতপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঞ্ছিত বস্তুটি তৈরি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে كُن (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়। واللهُ سبحانهُ وتعالى اعلم

سورة الصفت

সূরা সাফ্‌ফাত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣ اِنَّ اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥ اِنَّا زَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧
لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُوْرًا
وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু।

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, (২) অতপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের---(৪) নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকা-রাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি (৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (৮) তারা ঊর্ধ্ব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয় (৯) তাদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শপথ সে ফেরেশতাদের, যারা) ইবাদত (অথবা আল্লাহ্‌র আদেশ শ্রবণ করার সময়) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, (এ সূরায় পরে উল্লিখিত وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ

আয়াতখানি এ ব্যাখ্যার প্রমাণ।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা (জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশ থেকে সংবাদ সংগ্রহকারী শয়তানদের পথে) প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। (এ ব্যাখ্যার প্রমাণও এ সূরাতেই সত্বর উল্লিখিত হবে।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা যিকর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা) তেলাওয়াত করে। যেমন, এ সূরায়ই বলা হবে وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ মোটকথা এসব শপথের পর বলা হয়েছে— তোমাদের (সত্যিকার) মাবূদ এক। (তাঁর একত্বের প্রমাণ এই যে) তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের পালনকর্তা (অর্থাৎ এগুলোর মালিক ও অধিকর্তা) এবং পালনকর্তা (নক্ষত্ররাজির) উদয়াচলসমূহের। আমিই সুশোভিত করেছি নিকটতম আকাশকে এক (অভিনব শোভায় অর্থাৎ) তারকারাজির মাধ্যমে এবং (এসব তারকা দ্বারাই আকাশের অর্থাৎ তার সংবাদাদির) সংরক্ষণ করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (এর পদ্ধতি পরে বর্ণিত হয়েছে। হিফাযতের এ ব্যবস্থার কারণে) শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) কোন কথা শুনতে পারে না। (অর্থাৎ মার খাওয়ার ভয়ে অধিকাংশ সময় তারা দূরে দূরেই থাকে। দৈবাৎ কখনও কোন সময় সংবাদ শোনার চেষ্টা করলেও) তাদেরকে চারদিক থেকে (অর্থাৎ যেদিকেই সে শয়তান যায়,) মার দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। (তাদের এই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হল তাৎক্ষণিক।) আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামের) বিরামহীন আযাব। (সারকথা, আকাশের কোন সংবাদ শোনার পূর্বেই ওদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা শোনার নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালায় মাত্র।) তবে যে শয়তান কিছু সংবাদ ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়, একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে সে সংবাদ অপরের কাছে পৌঁছাতে পারে না। এসব ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ডই তওহীদের দলীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বিষয়বস্তু ঃ এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফিরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত লূত (আ) ও হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্‌র কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে।

প্রথম বস্তু তওহীদ ঃ সূরাটি তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতে মূল উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ নিশ্চিতই তোমাদের মাবূদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই ঃ শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোদের, অতপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতপর শপথ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী গাজীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর তথা তসবীহ্‌ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকে।

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে যিকর ও তিলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।---(তফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর বর্ণিত রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে الصَّافَّاتِ صَفًّا—এটি صف শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক রেখায় সন্নিবেশিত করা।---(কুরতুবী) কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ—وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ-অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ্‌ (রা) প্রমুখ

বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্যমার্গে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে।---(মাযহারী) কারও কারও মতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখনই সারিবদ্ধ হয়। ---(তফসীরে কবীর)

শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, ধর্মে প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একত্রিত হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বঃ বস্তুত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেনঃ তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না)।---(তফসীরে মাযহারী)

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবূ মসউদ বদরী (রা) বলেনঃ রসূলে করীম (সা) নামাযে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেনঃ সোজা হয়ে থাক, আগেপিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।---(মুসলিম, নাসায়ী।)

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا বর্ণিত হয়েছে। এটা زجر থেকে উৎপন্ন। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া। হযরত থানভী (র)-এর অনুবাদ করেছেন بند ش كرنے والے (প্রতিরোধকারী)। ফলে এ শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে

তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌঁছতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লিখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا—অর্থাৎ ফেরেশতাগণ 'যিকর'-এর তিলাওয়াত করে। যিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ বাক্য নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো তিলাওয়াত করে। এ তিলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও ইবাদত হিসাবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ পয়গম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌঁছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে 'যিকর'-এর অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণ নেওয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব ক'টি গুণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌঁছানো। বলা বাহুল্য, দাসত্বের কোন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লিখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ— একজনই তোমাদের সত্য মা'বুদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণঃ এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মক্কার কাফিররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের শপথ করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং কখনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) এ সম্পর্কে "আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন" নামে একটি

স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) উসূলে তফসীর সম্পর্কিত 'ইতকান' গ্রন্থের ৬৭তম অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

'ইতকান'-এ আবুল কাসেম কুশায়রী (র) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণা তাঁকে শপথ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ — আয়াত শুনে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র মত মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شهادت শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন---যেমন, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা এ কাজ করেছেন। যেমন, إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন যেমন إِي وَرَبِّي — এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে---

কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন---وَالسَّمَاءِ

وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا---এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্তু অধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে পৃথক নয়।---(ইবনে কাইয়্যেম)

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট বস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন---কোরআন পাকে রসূলে করীম (সা)-এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছে ঃ لَعَمْرُكَ

إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ---ইবনে মরদুবিয়্যাহ্‌ হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেন নি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও রসূলের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি ; কেবল রসূলে করীম (সা)-এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

---এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা হয়---যেমন, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্য যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব-স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহ্‌র শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ---

أن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لاحد أن يقسم الا بالله ـ

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোন বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ নয়।---(মাযহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহ্র শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মাবূদ এক আল্লাহ্। শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - তিনি পালনকর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টাও পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলীল। এখানে مشارق শব্দটি مشرق-এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ—এখানে سماء د ينا অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশ-গাত্রেই অবস্থিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ্ তা'আলা। অতএব আল্লাহ্কে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও জুলুম।

কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, না আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক কি?—এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ থেকে وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ পর্যন্ত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজসজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতের কথা-বার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়েবী সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শয়তান যৎ সামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও এখানে এত-টুকু বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নি-মণ্ডলের নিকটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্কাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং উর্ধ্ব-জগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কা-পিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কোরআনের পরিপন্থী নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণত বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরা ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই 'উল্কা' (Shooting Star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। উর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে Meteoriod বলা হয়) আগস্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০শে এপ্রিল, ২৮শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ ও ১৩ই ডিসেম্বরের রাতে হ্রাস পায়।— (আল্ জাওয়াহির)

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানতাভী মরহুম আল্-জাওয়াহির গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কোরআন পাক সমসাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোন কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যস্থিত একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তফসীরবিদগণ তাদের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ করে কোরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হন নি। পরিবর্তে বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায়-পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের ? আমরা কোরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নেবে।---(আল-জাওয়াহির ১৪ পৃঃ অষ্টম খণ্ড)

আসল উদ্দেশ্য ঃ এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়ত এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কোরআন বলে যে, শয়তানেদের ঊর্ধ্ব জগত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কোরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর স্বয়ং কোরআন কিরূপে অতীন্দ্রিয়বাদ হতে পারে ? এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে। অতপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

(১৪) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে। (১২) বরং আপনি বিস্ময় বোধ করেন আর তারা বিদ্রূপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বুঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে (১৫) এবং বলে, কিছুই নয়, এযে স্পষ্ট যাদু। (১৬) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (১৭) আমাদের পিতপুরুষগণও কি? (১৮) বলুন, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদের প্রমাণাদি থেকে যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব মহা-সৃষ্টির মধ্যে এমন সব কর্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং এসব মহাসৃষ্টি তাঁরই আয়ত্তাধীন, তখন) আপনি (যারা পরকাল অস্বীকার করে,) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্যান্য (এসব) যা সৃষ্টি করেছি? (যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল। সত্য এই যে, এগুলো সৃষ্টি করাই কঠিনতর। কেননা,) আমি তাদেরকে (আদম সৃষ্টির সময় এক মামুলী) এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (যাতে না শক্তি আছে, না সামর্থ্য। সুতরাং এ মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষও তেমন শক্তিশালী ও শক্ত নয়। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন আমি এমন শক্তিধর ও শক্ত সৃষ্টিকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে সক্ষম, তখন মানুষের মত দুর্বল সৃষ্টিকে একবার মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবো না কেন? কিন্তু এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কাফিররা পরকালের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী নয়;) বরং (তদুপরি) আপনি তো (তাদের অস্বীকৃতির কারণে) বিস্ময় বোধ করেন, আর তারা (আরও এগিয়ে গিয়ে পরকাল বিশ্বাসের প্রতি) বিদ্রূপ করে। যখন তাদেরকে (যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা) বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না এবং যখন তারা কোন মুজিযা দেখে (যা পরকাল সংক্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আপনার নবুয়তের স্বপক্ষে তাদেরকে দেখানো হয়,) তখন তার প্রতিই উপহাস করে এবং বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (কারণ, এটা মু'জিযা হলে আপনার নবুয়ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর আপনাকে নবী মানলে আপনার বর্ণিত পরকাল বিশ্বাসও মানতে হবে। অথচ আমরা তা মানতে পারি না) কেননা আমরা যখন মরে মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও কি? আপনি বলুন, হ্যাঁ অবশ্যই জীবিত হবে এবং তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত মহান সৃষ্টবস্তুসমূহের মুকাবিলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কা-পিণ্ডের ন্যায়, বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

"আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি"---একথার এক অর্থ এই যে, তাদের পিতামহ হযরত আদম (আ) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন হয়।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ তাদেরকে মুজিযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত বর্ণনা করে বলা হত, তিনি আল্লাহ্র নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, কিয়ামত আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেওয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ — অর্থাৎ আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ — অর্থাৎ তারা আপনার নবুয়ত ও শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে পারে—এমন কোন মুজিযা দেখলে তাকেও বিদ্রূপছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলীল আছে। তা এই যে.

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

অর্থাৎ এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে পুনরুত্থিত হব? ফলে আমরা কোনও যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং কোন মুজিযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেনঃ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ অর্থাৎ আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জীবিত হবে।

দৃশ্যত এটা একটা শাসকসুলভ জওয়াব, যা হঠকারীদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণও বটে। ইমাম রাযী 'তফসীরে কবীরে' এর ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ উপরে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। নিয়ম এই যে, যা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব লাভ করা কোন সত্য সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা স্থিরীকৃত হওয়ার পর কোন সত্যবাদী পয়গম্বর যদি বলেন যে, হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে, তবে এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা হওয়ার অকাট্য দলীল।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযার প্রমাণঃ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً বাক্যে آيَةً-এর আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। এখানে নিদর্শন বলে মু'জিযা বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-কে কোরআন ছাড়াও কিছু কিছু মু'জিযা দান করেছিলেন। কোন কোন বিপথগামী লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযাসমূহকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণাদির অধীন' সাব্যস্ত করে দাবি করে যে, তাঁর হাতে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন ঃ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (যখন তারা কোন মু'জিযা দেখে তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।) কোন কোন মু'জিযা অস্বীকারকারী বলে যে, এখানে آيَةً-এর অর্থ মু'জিযা নয়; বরং যুক্তিভিত্তিক দলীল। কিন্তু এটা ভুল। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আছে وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। বলা বাহুল্য' কোন যুক্তি-প্রমাণকে 'প্রকাশ্য যাদু' বলা সংগত নয়। একথা কেবল মু'জিযা দেখেই বলা যায়।

কেউ কেউ আরও বলে آيَةً-এর অর্থ কোরআন পাকের আয়াত। কাফিররা কোরআনের আয়াতগুলোকে যাদু আখ্যা দিত। কিন্তু কোরআন পাকের رَأَوْا (দেখে) শব্দটি এর পরিষ্কার বিরুদ্ধে। কেননা কোরআনের আয়াতকে দেখা হয় না----শোনা হয়। কোরআনের যেখানেই আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই শোনার কথা বলা হয়েছে---দেখার কথা নয়। কোরআন পাকে যত্রতত্র آيَةً শব্দটি মু'জিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত হযরত মূসা (আ)-র কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তবে তা প্রদর্শন কর---যদি তুমি সত্যবাদী হও।

এ কথার জওয়াবে মূসা (আ) তাঁর লাঠিকে সর্পে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন।

কোরআন পাকের কোন কোন আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের মু'জিযা প্রদর্শন করার দাবি মেনে নেন নি। জওয়াব এই যে, এটা সেক্ষেত্রে যেখানে বারবার মু'জিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যহ ইচ্ছামত নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত। এর প্রত্যুত্তরে মু'জিযা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ্র নবী আল্লাহ্র আদেশে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। যদি এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রত্যহ নতুন মু'জিযা প্রকাশ করা নবীর ভাবমূর্তির পরিপন্থী এবং এটা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার রীতি এই যে, কোন জাতি তাদের প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তবে ব্যাপক আযাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। যেহেতু উম্মতে-মুহাম্মদীকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা এবং ব্যাপক আযাব থেকে রক্ষা করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তাই তাদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা দেখানো হয়নি।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ
الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ احْشُرُوا الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ
إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

(১৯) বস্তুত সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র----যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে! (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটাই তো প্রতিফল দিবস। (২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) একত্র কর গোনাহ্‌গারদেরকে তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করত (২৩) আল্লাহ্ ব্যতীত। অতপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, (২৪) এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আজকের দিনে আত্ম-সমর্পণকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বস্তুত কিয়ামত হবে এক বিকট আওয়াজ (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁকে) তখন (এর কারণে) সবাই আকস্মিকভাবে (জীবিত হয়ে) প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এবং (পরিতাপ করে) বলবে. হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এই তো সেই প্রতিফল দিবস (বলে মনে হয়। ইরশাদ হবে, হ্যাঁ) এটাই ফয়সালার দিন. যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (পরবর্তীতে কিয়ামতেরই কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে,) একত্র কর জালিমদেরকে (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিল----) তাদের সতীর্থদেরকে (অর্থাৎ যারা তাদের দোসর ছিল) এবং সেসব উপাস্যকে; আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদত করত (অর্থাৎ শয়তান ও

প্রতিমা)। অতপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর (অর্থাৎ সেদিকে নিয়ে যাও) এবং (এরপর আদেশ হবে, আচ্ছা----) তাদেরকে (একটু) থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (সেমতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ) এখন তোমাদের কি হল যে, (আযাবের হুকুম শুনে) তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না! (অর্থাৎ কাফিরদের বড় বড় নেতা তাদের অনুসারীদের সাহায্য করছ না কেন, যেমন দুনিয়াতে ওরা তাদেরকে বিপথগামী করত? কিন্তু এখন জিজ্ঞাসার পরও ওরা সাহায্য করতে পারবে না।) বরং ওরা সেদিন নতশিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে হাশর-নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফির ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

প্রথম আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ - অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবী ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল (আ)-এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এই ফুঁৎকার দেওয়া হবে।----(কুরতুবী)

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা শিংগায় ফুঁক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। (তফসীরে-কবীর) কাফিরদের উপর ফুঁৎকারের প্রভাব হবে এই যে, فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ----সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম ছিল, তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। ----(কুরতুবী)

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ—অর্থাৎ যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের

জন্য ازواج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোন কোন তফসীর-বিদ-এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের 'মুশরিক স্ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে ازواج -এর অর্থ সতীর্থই। হযরত উমর (রা)-এর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ তফসীরবিদ এ আয়াতের তফসীরে হযরত উমরের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে. এখানে ازواجهم -এর অর্থ মুশরিকদের সমমনা লোক। সেমতে সুদখোরকে অন্য সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্য-পায়ীদের সাথে একত্র করা হবে।---(রূহুল-মা'আনী, মযহারী)

এ ছাড়া وما كانوا يعبدون-বাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্র করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে ওঠবে।

এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবেঃ

فاهدوهم إلى صراط الجحيم—অর্থাৎ এদেরকে জাহান্নামের পথপ্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে পুনরায় আদেশ হবেঃ وقفوهم إنهم مسئولون — এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ
الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۚ
بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ
بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا
تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

(২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। (৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। (৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদেরকে যখন বলা হত, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই," তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। (৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশরিকরা তখন একে অপরের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উপরন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যাবে) এবং একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ (অর্থাৎ মতবিরোধ) করতে থাকবে। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা নেতাদেরকে) বলবে, (আমাদেরকে তো তোমরাই বিভ্রান্ত করেছ; কেননা) তোমরা প্রবল শক্তিসহকারে আমাদের নিকট আগমন করতে (অর্থাৎ তোমরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে)। তারা (অর্থাৎ নেতারা) বলবে, না, বরং তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না এবং (তোমরা আমাদের প্রতি অহেতুক দোষারোপ করছ, কেননা,) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব তো ছিলই না। বরং তোমরা নিজেরাই সীমালংঘন করতে। অতএব (আমরা সবাই যখন কাফির ছিলাম, তখন জানা গেল যে,) আমাদের সবারই বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার (আদি) উক্তিই সত্য ছিল যে, আমাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির) স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (বস্তুত এর ব্যবস্থা হল এই যে,) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। (ফলে তোমরা

আমাদের জবরদস্তি ছাড়াই স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছিলে) এবং (এদিকে) আমরা নিজেরাও (স্বেচ্ছায়) পথভ্রষ্ট ছিলাম। সুতরাং উভয়ের পথভ্রষ্টতার কারণ একত্রিত হয়ে গেছে। এতে তোমাদের নিজেদের ইচ্ছাই তোমাদের পথভ্রষ্টতার বড় কারণ। এমতাবস্থায় নিজেদেরকে নির্দোষ বলতে চাও কেন? অতপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন উভয় দলের কুফরে শরীকানা প্রমাণিত হল, (তখন) তারা সবাই সে দিন শাস্তিতে (-ও) শরীক হবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনি ব্যবহার করে থাকি। (অতপর তাদের কুফরী ও অপরাধের বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে,) তারা (তওহীদেও অস্বীকার করত এবং রিসালতেও। সুতরাং) যখন তাদেরকে (রসূলের মাধ্যমে) বলা হত, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই", তখন (তা মানত না এবং) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (এতে করে তওহীদ ও রিসালত উভয়টির প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করা হল। আল্লাহ্ বলেন, এ পয়গম্বর, না কবি, না উন্মাদ) বরং (একজন পয়গম্বর---) তিনি সত্য দীন নিয়ে আগমন করেছেন এবং (তওহীদের মূলনীতি প্রভৃতি বিষয়ে) অন্যান্য পয়গম্বরগণের সত্যায়নও করেন। (অর্থাৎ তিনি যেসব মূলনীতি বর্ণনা করেন, তাতে সমস্ত পয়গম্বরই একমত। সুতরাং এসব মূলনীতি অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সত্য---কল্পনাবিলাস নয়। আর সত্য কথা বলাও উন্মাদনা নয়। অন্য উম্মতরাও তাদের পয়গম্বরগণের সাথে এমনি আচরণ করেছে। কিন্তু এখানে সরাসরি আরবের কাফির সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কেবল এ উম্মতের কাফিরদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সরাসরি এ অভিন্ন শাস্তির আদেশ শোনানো হবে।) তোমাদের সবাইকে (অর্থাৎ অনুসারী এ অনুসৃত উভয়কেই) বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার হয়নি; কেননা,) তোমরা যা (অর্থাৎ কুফরী ইত্যাদি) করতে, তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র বাছাই করা বান্দা। (অর্থাৎ সে মু'মিনগণ, যারা সত্যের অনুগামী হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন---এমন বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফির সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না, বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপেই ফুটে উঠেছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ—এ বাক্যে يَمِين শব্দের একাধিক অর্থ হতে

পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তফসীর করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া يَمِيْن -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ্) ভ্রান্ত। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ —এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহবান জানানোর একথা বলে আযাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾
عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ
اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا
لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ
الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ

مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ
الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

(৪১) তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রূযী (৪২) ফলমূল এবং তারা সম্মানিত, (৪৩) নিয়ামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। (৪৫) তাদেরকে ঘুরেফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ শরাবপাত্র, (৪৬) সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৪৭) তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণিগণ; (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) অতপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) অতপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! (৫৭) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫৯) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় এ-ই মহা সাফল্য। (৬১) এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের) জন্য রয়েছে এমন খাদ্য-সামগ্রী যা (অন্যান্য সূরা) জানা হয়েছে; (অর্থাৎ) ফলমূল। (এগুলো প্রাপ্ত হওয়ার কথা সূরা ইয়াসীনের لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে এবং এগুলোর গুণাগুণ সূরা ওয়াকেয়ার وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ — আয়াতে ইতিপূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, সূরা ইয়াসীন ও সূরা ওয়াকেয়া সাফফাতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এতকানে তাই বর্ণিত আছে।) তারা অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থায় সুখময় উদ্যানসমূহে মুখোমুখি উপবিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে এমন পানপাত্র আনা হবে (অর্থাৎ জান্নাতী বালকরা আনবে,) যা প্রবাহিত শরাবে পূর্ণ করা হবে, (এতে করে

শরাবের প্রাচুর্য ও স্বচ্ছতা বোঝা গেল। এই শরাব দেখতে) হবে শুভ্র (আর তা পান করতে) পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। (দুনিয়ার শরাবের মত) এতে মাথা-ব্যথা হবে না এবং এতে তাদের চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে না। তাদের কাছে থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণী (হুর)-গণ। তারা (এমন গৌরবর্ণ হবে,) যেন (পাখার নিচে) লুক্কায়িত ডিম (যা ধূলাবালি, দাগ ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকে; অর্থাৎ ডিমের মত পরিচ্ছন্ন হবে)। অতপর (যখন সবাই বৈঠকে একত্রিত হবে, তখন) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (এ কথাবার্তার মধ্যে জান্নাতীদের) একজন বলবে, (দুনিয়াতে) আমার এক সঙ্গী ছিল। সে (বিস্ময়ভরে) আমাকে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তার পরেও আমরা (পুনরুজ্জীবিত হব এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে) প্রতিফলপ্রাপ্ত হব? (অর্থাৎ সে পরকাল অস্বীকার করত। তাই অবশ্যই সে জাহান্নামে পৌঁছে থাকবে।) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন, (হে জান্নাতিগণ,) তোমরা কি (তাকে) উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (চাইলে অনুমতি রয়েছে।) অতপর সে (অর্থাৎ কাহিনী বর্ণনাকারী) উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর আলোচ্য সঙ্গীকে) জাহান্নামের মাঝখানে (পতিত) দেখতে পাবে। (তাকে সেখানে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ্র কসম তুমি যে আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! (অর্থাৎ আমাকেও পরকালে অবিশ্বাসী বানাতে চেষ্টা করেছিলে।) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে, (কারণ, তিনি আমাকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের উপর কায়েম রেখেছেন,) আমিও (তোমার মত) গ্রেফতার-কৃতদের মধ্যে থাকতাম। (এরপর জান্নাতী ব্যক্তি বৈঠকের লোকদের বলবে,) (দুনিয়ার) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের এখন আর মৃত্যু হবে না এবং আমরা আযাবও ভোগ করব না। (এসব কথাবার্তা এই আনন্দের আতিশয্যে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং চিরতরে সুখী করেছেন। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, উপরে বর্ণিত জান্নাতের সকল দৈহিক ও আত্মিক নিয়ামত লাভ করা) নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যই পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ — এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য

এমন রূযী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ বলেন, رزق معلوم- এর অর্থ এই যে, এ রিযিকের সময়কাল নির্দিষ্ট ও জানা। অর্থাৎ এ রিযিক সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হবে। অন্য এক আয়াতে غدوة و عشيا (সকাল ও সন্ধ্যা) পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় এক তফসীর এই যে, সেটা নিশ্চিত ও স্থায়ী রিযিক হবে। দুনিয়ার মত নয় যে, কেউ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারে না যে, আগামীকাল কি এবং কতটুকু রিযিক পাবে। দুনিয়াতে কেউ একথাও জানে না যে,তার অর্জিত রিযিক কত দিন তার কাছে থাকবে। আজ যে নিয়ামত আছে কাল হয়তো তা থাকবে না---প্রত্যেকেই এই আশংকায় সদা শংকিত থাকে। কিন্তু জান্নাতে এমন কোন আশংকা থাকবে না। জান্নাতের রিযিক যেমন নিশ্চিত, তেমনই চিরস্থায়ী।---(কুরতুবী)।

فواكه– শব্দের মাধ্যমে কোরআন নিজেই জান্নাতের রিযিকের তফসীর করে দিয়েছে যে, সে রিযিক হবে ফলমূল। এ শব্দটি فاكهة–এর বহুবচন (যে বস্তু ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়, তাকেই আরবী ভাষায় فاكهة বলা হয়। ফলমূল স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় 'ফলমূল'। অন্যথায় এর অর্থ ফলমূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী فواكه শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে---ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। কারণ, জান্নাতে মানুষের কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেখানে জীবন ধারণ অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না। তবে আকাঙ্ক্ষা হবে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলেই আনন্দ লাভ হবে। জান্নাতের যাবতীয় নিয়ামতের লক্ষ্যই হল আনন্দ দান করা।

وهم مكرمون – বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিযিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে দেওয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

على سرر متقابلين—এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা

রাজাসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের রাজাসন ঘূর্ণায়মান হবে, যার সাথে কথা বলতে হবে, তার দিকেই ঘুরে যাবে।

لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ—لَذَّةٍ— শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذَاتُ لَذَّةٍ—অর্থাৎ স্বাদবিশিষ্ট। কিন্তু এসব ঘষা-মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই। প্রথমত এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই শরাব পানকারীদের জন্য 'সাক্ষাৎ স্বাদ' হবে। এছাড়া এটা لَذّ বিশেষণ পদের স্ত্রীলিঙ্গ لَذَّةٍ-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।---(কুরতুবী)

لَا فِيْهَا غَوْلٌ—غول--এর অর্থ কেউ 'মাথা ব্যথা' এবং কেউ 'পেট ব্যথা' বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ দুর্গন্ধ ও আবর্জনা,' কেউ 'মতিভ্রম হওয়া' উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর বলেন, এখানে غول--এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মত কোন আপদ হবে না। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, দুর্গন্ধ, মতিভ্রষ্টতা ইত্যাদি কিছুই হবে না।

قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ - অর্থাৎ জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, ---আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ্ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জওযী قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ--এর আরও একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা

এমন "অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা" হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না।----(তফসীরে যাদুল মাসীর)

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ----এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরব-দের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়নি; বরং ডিমের বাকলের অভ্যন্তরস্থিত ঝিল্লীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই রমণিগণ ডিমের ঝিল্লীর ন্যায় নরম ও কোমল হবে।---(রূহুল মা'আনী)

এক জান্নাতী ও তার কাফির সঙ্গী : প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জান্নাতীর বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফির বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে সে জাহান্নামের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কোরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিত-রূপে বলা যায় না যে, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মু'মিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহুদাহ' এবং তার কাফির সঙ্গীর নাম 'মাতরূস'। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহ্ফের وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ আয়াতে করা হয়েছে।---(মাযহারী)

আল্লামা সুয়ূতী কতিপয় তাবেয়ী থেকে এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, দুই ব্যক্তি একত্রে কারবার করে আট হাজার দীনার মুনাফা অর্জন করল এবং উভয়ে চার হাজার করে বন্টন করে নিল। একজন তার অর্থ থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু জমি খরিদ করল। অপরজন ছিল খুবই সৎ ও সাধু ব্যক্তি। সে দোয়া করল : ইয়া আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার দিয়ে জমি খরিদ করেছে। আমি আপনার কাছ থেকে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জান্নাতে জমি খরিদ করতে চাই। অতপর সে এক হাজার দীনার গরীব-দুঃখীকে দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার ব্যয় করে একটি গৃহ নির্মাণ করলে সে হাত তুলে বলল : ইয়া আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার ব্যয় করে পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আপনার কাছ